# অধ্যাপক সুকুমার সেনের স্মৃতি

অনিমেষ কান্তি পাল



(এক)

ড. সুকুমার সেন তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান এবং সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাই তাঁর গবেষণার প্রথম লক্ষ্য ছিল। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' নামক বইয়ে তাঁর ঐ বিশেষ ভাষা-জিজ্ঞাসার বহু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। তবে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চায় তিনি নিজে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাননি বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর 'নারীর ভাষা' সম্বন্ধীয় কাজটি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেই করা হয়েছিল। কিন্তু এই কাজটির শেষাংশে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েলি প্রবাদের একটি ভালো সংগ্রহ রয়েছে। তাঁর 'বর্ধমানের মুচিদের উপভাষা' বিষয়ক আলোচনাটি সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো করা যেত। কিন্তু এটিও স্পষ্টত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অনুসরণ।

'ভাষার ইতিবৃত্ত' নামক বইয়েতেই বাংলা শব্দের উৎস সন্ধানের জন্য তিনি সর্বানন্দের 'টীকা সর্বস্ব' থেকে অনেকগুলি শব্দ বেছে নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাম্রশাসন, দানপত্র ইত্যাদিতে প্রাপ্ত প্রাচীন স্থাননামগুলি নিয়েও ঐ জায়গাতেই আলোচনা করা হয়েছে। শব্দের মূলানুসন্ধানই ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর পরিণতি মননে সবচেয়ে বেশি গুত্ব পেয়েছিল। শেষ জীবনে মধ্যযুগীয় বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি অভিধান সঙ্কলনের কাজ করেছেন তিনি। এই একটিতে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রাতীত।

অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর কোনো ভাষা জানা না থাকায় ড. সেন বাংলা ভাষায় সব রকম শব্দের মূলানুসন্ধানে হয়তো অগ্রসর হতে পারেন নি। কিন্তু সংস্কৃত মূল শব্দগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি খুব বেশি। ব্যুৎপত্তি নির্ণায়ক অভিধানটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ড. সেন সারা জীবন ধরে যে সব গবেষণা কর্মের নির্দেশক ছিলেন, সেগুলিকে বোধহয় মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করে দেখানো যায় — (১) ভাষা বিষয়ক গবেষণা, (২) সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা, (৩) লোক সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবন বিষয়ক গবেষণা। এর মধ্যে অবশ্যই ভাষা-বিষয়ক গবেষণার সংখ্যায় বেশি। তার মধ্যে আবার বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা সম্বন্ধীয় গবেষণারই প্রাধান্য ছিল। অন্যান্য নানা ধরনের উপভাষার মধ্যে সামাজিক বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক এবং লিঙ্গভিত্তিক উপভাষা চর্চায় ড. সেন নিজে যেমন অগ্রণী হয়েছেন, তেমনি তাঁরই প্রেরণায় ড. পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী বীরভূমের রাণা কামারদের উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। পরে আরো কয়েকজন এই ধরণের গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

তবে বলা উচিত যে, বিশেষভাবে শব্দ প্রয়োগের বিশিষ্টতা সম্বন্ধেই তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। এই ক্ষেত্রটি অধ্যাপক সুকুমার সেনের ভাষা জিজ্ঞাসার একটি প্রধান দিক। প্রথম থেকে শেষাবধি বাংলা শব্দের মূলানুসন্ধান তাঁর গবেষণার এক প্রধান বিষয়। ছড়ার আদিরূপ অন্বেষণ, ছড়ার শব্দেরও মূলানুসন্ধান এবং তার আদি অর্থ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে ড. সেন পথিকৃতের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী।

স্নাতক পর্যায়ে সুকুমার সেন মহোদয় সংস্কৃত অনার্সের ছাত্র ছিলেন। তারপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান পড়তে যান তারাপোরওয়ালা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তারাপোরওয়ালা বিদায় নেওয়ার পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর সুনীতিকুমার অবসরগ্রহণ করার পর তিনি ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। বহুদিন তিনি ছিলেন ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানীদের জাতীয় সংস্থা 'লিঙ্গুইস্টিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া'র সম্পাদক। এই সদর দপ্তর অর্থাভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুণের ডেকান কলেজে স্থানান্তরিত হয়। ড. সেন বেশ কয়েক বছর ধরে পুণের ভাষাবিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় কাটাতেন। ১৯৯২ সালে তাঁর যখন মৃত্যু হয়, তখন ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় আর বাংলা সাহিত্যের এক প্রবাদ পুষ।

(দুই)

বাংলা সাহিত্যের কোন্ ক্ষেত্রটিতে অধ্যাপক সুকুমার সেনের অবদান এখনো স্মরণীয় হয়ে আছে, তা একটু মনে করে দেখা যেতে পারে। তিনি নানা সময়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। কয়েকটি গল্পও লিখেছিলেন। তাছাড়া তাঁর আত্মজীবনী 'দিনের পরে দিন যে গেল' অতি উপাদেয় রচনা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এ জন্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে নেই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর এই একটি রচনা আসলে তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী গবেষণার ফসল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসটি রচনা করেছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন মহোদয়। তারপর দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য একটি মিনারতুল্য কাজ। এরপরে অধ্যাপক সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয়েছে। অধ্যাপক সেনের পরে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যরা যেসব ইতিহাস রচনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের, সেগুলির পিছনে মৌলিক গবেষণার কোনো নিদর্শন নেই বললেই চলে।

অধ্যাপক সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সাজানো হয়েছে বিশুদ্ধ কালক্রম অনুযায়ী। বিশেষ করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সময় প্রতিটি সাহিত্যকর্মের কালনির্ণয়ে তিনি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ অন্বেষণ করেছেন। পূর্ববর্তী মত নতুন করে যাচাই করে গ্রহণ কিংবা বর্জন করেছেন। বহু ক্ষেত্রে নিজে গবেষণা করে নতুন তথ্য যোগাড় করেছেন। অজস্র পুঁথি নিজে পড়ে দেখেছেন। অনুমানের উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তিনি সচরাচর রাজি ছিলেন না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পুরো একটি খন্ড জুড়ে তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তিনি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তা বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এই রবীন্দ্র-বিষয়ক খন্ডটি থেকে। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। আসলে, সমসাময়িক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি তাঁকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতেপারেনি। তথাপি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করার সময় কোনো তথ্যই তিনি উপেক্ষা করেন নি। সাহিত্যের, বিশেষত আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন লেখকের মূল্যবিচার তাঁর কাছে গুত্ব পায় নি।

তিনি মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনা নিয়ে আলাদা একটি বই লিখেছিলেন। তথাপি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমান লেখকদের রচনাগুলিকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। পরবর্তীকালে দেখা যায় 'পরিচয়' গোষ্ঠী, তথা বামপন্থী সাহিত্যিকদের প্রতিও তিনি অনুকূল ছিলেন না। কিন্তু এক্ষেত্রেও ঐতিহাসিকের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর অপক্ষপাতী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর এই ইতিহাস সম্বন্ধেঅনেকেই সমালোচনা করে বলেছেন যে এতে কেবল তথ্য এবং সন-তারিখের স্তূপ রচনা করা হয়েছে, সাহিত্যের মর্মানুসন্ধান করা হয় নি। আসলে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজ; ইট, পাথর যোগাড় করার কাজেই তাঁকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। তাছাড়া পুরোনো ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব মুক্ত হওয়ার চেষ্টা তখনো শু হয়নি। তখনো ইতিহাস অর্থে রাজরাজড়া, যুদ্ধবিগ্রহ, সনতারিখের বিবরণই বোঝা হত। হিস্টিরিওগ্রাফী নিয়ে তখনো আমাদের দেশে কেউ মাথা ঘামাননি। ইতিহাসে দৃষ্টিভঙ্গীর গুত্ব নিয়েও সেই সময়ে অন্য

কেউ মাথা ঘামাননি। কাজেই অধ্যাপক সেনকে দৃষ্টিভঙ্গীর গতানুগতিকতার জন্য দোষী করা সমীচীন নয়।

তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আর একটি গুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল — হিন্দু বৌদ্ধযুগ, মুসলমান যুগ ইত্যাদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে না দেখা। বাস্তবিক পরবর্তীকালে মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনা নিয়ে আর একটি বই রচনা তাঁর গোঁড়ামিমুক্ত অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় তুলে ধরেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সন-তারিখের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্যে তিনি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। তথ্য সব পাওয়া যায় নি, নির্ভুল তথ্য নির্ণয় করাও সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। এজন্যও অধ্যাপক সেনকে দোষ দেওয়া যায় না।

(তিন)

অধ্যাপক সুকুমার সেনের অ্যাকাডেমিক কাজকর্মের বিবরণ দেওয়ার পর যৎসামান্য ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যখন কলেজে বাংলা অনার্স পড়তে ভর্তি হলুম, তখনই প্রথম সুকুমার সেন মহোদয়ের কথা জানতে পারলুম। তাঁর লেখা 'ভাষার ইতিবৃত্ত' নামক বইটির সঙ্গে পরিচিত হতেই হল। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ. পড়তে এসে তাঁর ছাত্র হলুম। দেখলুম — অধ্যাপক সুকুমার সেন মোটাসোটা রাশভারি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের তিনি তখন প্রধান হয়েছেন। বছর কয়েক আগে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অবসর নিয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর পদটিতে ড. সেনকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তখন তাঁরও দেশব্যাপী খ্যাতি। ছাত্রমহলে প্রবল প্রতাপ। তাঁর পাণ্ডিত্য এমনই যে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত ভয় পেত। তিনি ক্লাসে ঢুকেই গম্ভীরভাবে পড়াতে শু করতেন। একটিও বাজে কথা বলতেন না। সহজভাবেই পড়ানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর পড়ানোর সঙ্গে তাল রাখার ক্ষমতা কম ছাত্রেরই ছিল। এক কথা একাধিকবার বলা তিনি পছন্দ করতেন না। কোনো ছাত্র উঠে যদি বলতো — বুঝতে পারছি না — তিনি সে কথায় কান দিতেন না। মূর্খতার সঙ্গে তাঁর আপোষ ছিল না। তাই তাঁকে জনপ্রিয়তম অধ্যাপক বলা যেত না।

তখনকার অধ্যাপকদের ড. সেনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ড. সেন তাঁর শিক্ষকদের কোনো কোনো মতের প্রকাশ্য সমালোচনা করতেও দ্বিধা করতেন না। তাঁর লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়লেই যে কোনো পাঠকই বুঝতে পারবেন যে তিনি কোনো বিষয়ই বিনা প্রমাণে গ্রহন করতেন না। যুক্তি এবং তথ্যপ্রমাণ ছাড়া নিজেও কোনো সিদ্ধান্তে আসতেন না। আগেরকার গবেষকদের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু কারো প্রতিই তাঁর অন্ধ আনুগত্যের প্রকাশ দেখা যেত না। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অনেক বক্তব্যই তিনি অগ্রাহ্য করতেন। কিন্তু কারো প্রতি তাঁর অবজ্ঞা প্রকাশ পেত না। তাঁর মধ্যে আমরা একজন আপোষহীন সত্যসন্ধানীকে দেখতে পেতুম। এসবই ছিল তাঁর বাইরের পরিচয়।

তাঁর ভিতরের পরিচয়টা জানতে পেরেছিলুম অনেক পরে। তখন ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে মাঝে মাঝে যাই। তাঁর যথেষ্ট প্রশ্রয় পাই। বাংলা উপভাষায় একটি বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি এবং তাঁর সমর্থনও পাই। একদিন ক্লাসে ঐ বিষয়টি নিয়েই ড. সেন আলোচনা করছিলেন। তাঁর বলা শেষ হলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার নিজের মতটি তাঁকে জানালুম। আসলে সেটি ছিল অধ্যাপকের মতের বিরোধিতা। অধ্যাপক সেন একটু অবাক হলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ক্লাসে ভাষা-বিষয়ক তর্ক করা ছাত্রদের স্বপ্নের অতীত ছিল। আমার পক্ষেও যথেষ্ট দুঃসাহসের কাজ ছিল সেটা। কিন্তু এ বিষয়ে আগেই আমি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের সমর্থন পেয়েছিলুম। তাই আমার মত আঁকড়ে থাকার মতো সাহস হয়েছিল। অধ্যাপক সেন কঠোর গলায় আমাকে বললেন — যা বলছেন, তাঁর পক্ষে প্রমাণ দিতে পারবেন? আমি বললুম — সামনের সপ্তাহের ক্লাসে আমি প্রমাণ নিয়ে আসব। তিনি পিছনে না তাকিয়ে চলে গেলেন। পরের সপ্তাহে আমার বক্তব্য ও তার পক্ষে প্রমাণগুলি সংক্ষেপে ভালো করে লিখে তাঁর

হাতে দিলুম।

এক সপ্তাহ পরে ক্লাসে ঢুকেই আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন — আপনার বক্তব্য আমি মানছি। আপনি পাশ করেই আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমার সহপাঠীরা সবাই অবাক হয়ে গেল। এমন ব্যাপার তখন ঘটতো না। এম. এ. পরীক্ষার ফল বেরোনোর সাতদিন পরেই তাঁর কাছে গেলুম। বললেন — আপনি এসেছেন? খুব ভালো। যান — পি. এইচ. ডি. করার জন্য একটি আবেদনপত্র কিনে আনুন। এখনই নিয়ে আসুন। আমি আপনার জন্যে বসে থাকছি। সেই দিনই অধ্যাপক সুকুমার সেনের সুপারিশ-সহ আমার আবেদনপত্র জমা পড়ে গেল এবং পি. এইচ. ডি. কমিটির পরবর্তীসভায় তা মঞ্জুর হল। কারণ সুকুমার সেনের সুপারিশের বিদ্ধে কেউ আপত্তি তুলতে সাহসী হতেন না।

কিন্তু সেই সময় আমার পড়াশুনায় একেবারেই মন ছিল না। উৎসাহ ছিল রাজনীতিতে আর দুশ্চিন্তা ছিল নিজের মনের মতো চাকরী পাব কিনা — সেই বিষয়ে। ফল বেরোনর সাতদিনের মধ্যে সুকুমার সেন মহোদয় আমার গবেষণাকর্মের অনুমতির জন্য সুপারিশ করলেন। এবং এক মাসের মধ্যে চাকরীও পেয়ে গেলুম। মাইনে তখনকার দিনে ভালোই ছিল। অধ্যাপকরাও তখন ঐরকম বেতন পেতেন না। কিন্তু কাজটি লেখাপড়া করার অনুকূল ছিল না। এই সময় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক সুকুমার সেন — দুজনের বাড়িতেই মাঝে মাঝে যেতুম। তাঁরা গবেষণার বিষয়ে নানা নির্দেশ দিতেন, উপদেশ দিতেন, আলাপ-আলোচনা করতেন। কিন্তু সুকুমার সেন মহাশয়ের কাছে মন খুলে কথা বলা যেত না। বুঝতে পারতুম, বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে আমার যোগাযোগ তিনি অপছন্দ করতেন। আমার মানসিক অস্থিরতাকেও তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

একদিন মুখের উপরে বললেন — 'সত্যি সত্যি গবেষণা করতে কেউ চায় না — সব মতলবিয়া, পড়াশুনো নয়, কেবল চাকরির ধান্দা।" তাঁর কাছে যাওয়া কমিয়ে দিলুম। কেবল ড. চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে পড়াশোনা শু ন্যাশান্যাল লাইব্রেরিতে। তাঁরই উৎসাহে এবং চেষ্টায় ক্ষেত্রীয় অনুসন্ধানের জন্য তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার সুযোগ পেলুম। তখনকার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মহম্মদ আলীর ছোটো ভাই আহম্মদ আলী ছিলেন কলকাতায় পাকিস্তানের উপ-রাষ্ট্রদূত। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আহম্মদ আলী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই-এর কাছে চিঠি দিয়ে আমাকে পরিচিত করে দিলেন। অধ্যাপক সেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি খুশি হলেন, বললেন — 'অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এবার কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ কন।'

কিন্তু ঢাকায় দু'মাস কাটিয়েও বিশেষ কিছু লাভ হল না। শহীদুল্লাহ সাহেব তখন করাচীতে ছিলেন। তারপর পাকিস্তানী গোয়েন্দারা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। ক্ষেত্রীয় অনুসন্ধানে বাধা দিতে লাগল। টাকা পয়সাও ফুরিয়ে গেল। তখন ফিরে আসা ছাড়া উপায় রইল না। ফেরার পথে দর্শনা স্টেশনে আমার সংগৃহীত তথ্যে ঠাসা টেপরেকর্ডারের দুটি স্পুল বাজেয়াপ্ত হল। অত্যন্ত বিমর্ষ মনে ফিরে এলুম এবং গবেষণার চেষ্টা ছেড়ে দিলুম। আমার অনুমতি বাতিল হয়ে গেল। আর অধ্যাপক সুকুমার সেনের ধারে-কাছেও যাই না। কেবল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের বাড়িতে মাঝে মাঝে যাই।

১৯৬৪সালে দিল্লীতে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যোগ দেবেন। হঠাৎই একদিন আমাকে বললেন — আপনিও সঙ্গে চলুন। গবেষণা যতটুকু হয়েছে, তারই উপর ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ রচনা কন। দিল্লি গিয়ে দেখলুম, অধ্যাপক সুকুমার সেনও সেই সভায় উপস্থিত। যেদিন প্রবন্ধটি পাঠ করলুম, সেদিনও তিনি সভায় ছিলেন। আমার প্রবন্ধটি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হল। আমি জবাবও দিলুম এবং সুনীতিকুমারের জোরালো সমর্থন পেলুম। অধ্যাপক সেন কিন্তু কোনো কথাই বলেন নি। কিন্তু বিজ্ঞান ভবনের প্রবেশপথে তিনি আমাকে পাকড়াও করলেন। বললেন — পড়াশোনা তো চালিয়ে যাচ্ছেন দেখছি। গবেষণাটা শেষ কন।

তাঁর গলায় শিক্ষকসুলভ কোমলতা আমাকে অভিভূত করল। আমি বললুম — আমার অনুমতি -- ব্যবস্থা করে দেব। আপনি তো সবই জেনে গেছেন। এখনতো কেবল লেখাটা বাকি। কাজ আবার শু হল এবং অধ্যাপক সুকুমার সেনের অকৃপণ স্নেহের ভাগ পেতে শু করলুম। যেদিনই কোনো লেখা নিয়ে যেতাম, সেদিনই তিনি প্রসন্ন হতেন, চা-মিষ্টি খাওয়াতেন আর খালি হাতে গেলে তিরস্কার করতেন। তাঁর এই কঠোর-কোমল রূপ একইসঙ্গে প্রকাশ পেত। তখন তাঁর সঙ্গে নির্ভয়ে তর্ক করার অধিকার পেলুম। কিন্তু প্রচুর বকুনিও জুটে যেত।

১৯৬৭ সালে মস্কো যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলুম। সেখানকার ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। আমার হাত দিয়ে তাঁদের কাছে বইপত্র পাঠালেন। এই সময় থেকে আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করতেন এবং পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিতেন। অর্থাৎ ঐ সময় থেকেই মনে হয়, তিনি আমাকে ছাত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন মন থেকে। যখন সম্পূর্ণ থিসিসটি তাঁর হাতে তুলে দিলুম, তখন তিনি তা একটু নেড়েচেড়ে দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর এতখানি আস্থা ছিল আমার লেখার উপর। তিন মাসের মধ্যেই আমার কপালেও একটা পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি জুটে গেল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের জাতীয় গ্রন্থাগারের অফিসে যেদিন আমার মৌখিক পরীক্ষা হল, সেদিন তো দুই প্রিয় অধ্যাপকের কাছে এমন প্রশ্রয় পেলুম যা আমৃত্যু মনে রাখার মতো।

অধ্যাপক সুকুমার সেনের বহু ছাত্র-ছাত্রী এখনও জীবিত আছেন। সকলে তাঁর স্নেহ-কোমল মনটির স্পর্শ পান নি। কারণ যোগ্যতার প্রমাণ দিতে না পারলে কাউকে তিনি গ্রহণ করতেন না। লেখাপড়ার মান সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত কড়া ছিলেন এবং তাঁর নিজের মান এমন উঁচু ছিল যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের তাঁকে ছোঁওয়ার সাধ্য ছিল না। আমি পড়াশোনায় অমনোযোগী ছিলাম, খামখেয়ালি ছিলাম, কোনোমতেই তাঁর যোগ্য ছাত্র ছিলাম না। তথাপি একদিন তাঁর প্রকৃত স্নেহ পেয়েছিলাম। অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাঁকে ভুল বুঝেছেন। অধ্যাপক হিসেবে, গবেষক হিসেবে, ভাষা ও সাহিত্যের নিরলস সাধক হিসেবে তাঁর পূর্ণ-মূল্যায়ন আজও হয়নি। যেমন রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠা এবং অনুরাগের কথা সাধারণ মানুষ হয়তো ততটা জানেন না। তিনি নিজে গান গাইতে পারতেন বলে শুনিনি, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনি ছিলেন আজীবন মুগ্ধ শ্রোতা। তাঁর আত্মজীবনীর নামে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি 'দিনের পরে দিন যে গেল।'

সারা জীবন সরল অনাড়ম্বর ভাবে কাটিয়ে গেছেন। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা সত্ত্বেও যতক্ষণ জেগে থাকতেন, হয় লেখা না-হয় পড়ায় ব্যস্ত থাকতেন। আড্ডা দিতেও ভালবাসতেন কিন্তু যার-তার সঙ্গে নয়। তাঁর বন্ধু ছিলেন প্রতুল গুপ্তা এবং ঐ পর্যায়ের আরো কেউ কেউ। ভারতের নান জায়গায় তিনি বেড়াতে ভালোবাসতেন। এক পুত্র ও এক কন্যার তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা। আমার নগণ্য জীবনে তাঁর স্নেহাশীর্বাদ কত বড় পাথেয়, সেটাই বলতে গিয়ে নিজের কথাও একটু বলা হয়ে গেল। আশা করি, পাঠক নিজ গুণে ক্ষমা মার্জনা করবেন।



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com